□

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ প্রস্তাবনা

২০.২ প্যারেটোর তত্ত্ব

২০.৩ মসকার তত্ত্ব

২০.৪ মিশেল্‌সের তত্ত্ব

২০.৫ অনুশীলনী

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (Elite) সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করবেন। বিশেষত, এই অধ্যয়নের ফলে—

- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কাদের বলে তা জানতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কীভাবে ক্ষমতায় আসীন হয় এবং ক্ষমতাচ্যুত হয় সে সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবেন
- সংখ্যালঘু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর শাসন কায়েম করে সেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন এবং
- রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে কীভাবে দলীয় নেতাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অনমনীয় কর্তৃত্ব কায়েম হয় তা জানতে পারবেন।

সকল সমাজেই একটি সংখ্যালঘু মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যারা উৎকর্ষে উচ্চতর। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কিছু বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং বিশেষ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই শাসনের অধিকার অর্জন করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই হলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনজন ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী—প্যারেটো, মসকা এবং মিশেল্‌স্‌। এঁরা তিনজনই ম্যাকিয়াভেলির আধুনিক অনুগামী রূপে পরিচিত। এঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী। এঁরা মার্ক্সবাদেরও বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানাবিহীন সমাজে শ্রেণী বিলোপের মার্ক্সীয় তত্ত্বে আপত্তি জানিয়ে এঁরা বলেছেন যে, সকল সমাজেই শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে। এঁদের মতে, শাসন করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষেরই থাকে যারা প্রশাসনিক যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন। এঁদেরই শাসন করা উচিত এবং বাস্তবে এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গই শাসনকার্য পরিচালনা করে এসেছে ও ভবিষ্যতেও করবে। এটা শুধু বাস্তব নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে।

বর্তমান এককের পরবর্তী অংশে প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ বিশদে আলোচিত হল।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ভিলফ্রেডো প্যারেটোর (Vilfredo Pareto) মতে, মানুষ যেমন শারীরিকভাবে, তেমনি মানসিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের দিক দিয়েও অসমান। যে কোনও গোষ্ঠীতে যারা সর্বাপেক্ষা সমর্থ তাদেরই প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ('elites') বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় তিনি কোনও নৈতিক গুণমান ও স¥œানসূচক তাৎপর্য আরোপ করেননি। এই শব্দটির দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন যে, কোনও কর্মগত ক্ষেত্রে যারা সর্বাধিক সাফল্যের সূচকের অধিকারী—সফল ব্যবসায়ী, সফল লেখক, সফল উকিল, সফল শিল্পী—এর সকলেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তবে প্যারেটোর মতে, একমাত্র পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত সমাজে—কেবলমাত্র তাত্ত্বিক স্তরেই যার অস্তিত্ব—শ্রেষ্ঠত্বের অভিধার সাথে সর্বাধিক দক্ষতার পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব জগতে পারিবারিক যোগাযোগ বা পরিচিতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মর্যাদা অর্জনের পথে কিছুটা হেরফের ঘটায়। এর ফলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন ও সর্বাধিক দক্ষতার প্রকাশের মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখা দেয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (ruling and non-ruling elites)। দেশের শাসনকার্যে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে শৃগালের মতো প্রতারণার দ্বারা অথবা সিংহের মতো বলপ্রয়োগের দ্বারা এরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাকিয়াভেলির পরিভাষা অনুসরণ করে প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে 'শৃগাল' ও 'সিংহ'—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শৃগালগণ নমনীয়ভাবে পরিবেশ বা পরিস্থিতিগত প্রয়োজনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। এরা আদর্শবাদী (ideology) উদ্দেশ্যের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীতি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। প্রচার ও প্রতারণার দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। কূটনৈতিক রফার মাধ্যমে এরা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। কিন্তু সিংহগণ হল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের প্রতি এরা প্রবল আনুগত্য দেখায়। এদের

মধ্যে আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা শ্রেণীভিত্তিক একতাবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে বলপ্রয়োগে এরা ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বলপ্রয়োগের দ্বারাই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে।

প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসককুল একই সাথে সিংহোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে এবং কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম এবং শৃগালোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনক্ষম এবং বিবেকহীন—উভয়কে নিয়ে গর্বিত হবে। শাসককুলের মধ্যে যখন এই বিপরীতধর্মী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা অনমনীয় আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, যারা নবীকরণ ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম নয়, সেইসব কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাগাড়ম্বরকারীদের উপর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয়, যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে অপারগ। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তখন একটি আরও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রত্যেক সমাজেই সম্ভাব্য এবং অসন্তুষ্ট নেতারা থাকে। এদের হয় শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে অথবা অপসারিত করতে হবে। যখন কোনও শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকে, তখন তারা বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকলার চর্চায় মেতে থাকতে পারে। তারা অত্যন্ত সহনশীল ও সংযত হয়ে পড়তে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করার প্রবণতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এসময়ে সিংহোপম নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালোপম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গড়ে ওঠে, শাসন করে, অবক্ষয়ের স¥œÅখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসককুল দ্বারা অপসারিত হয়। প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "অভিজাততন্ত্রসমূহ স্থায়ী হয় না।...ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের কবরখানা।...বিদ্যমান ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং, উল্টোদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।" ("Aristocracies do not last...History is a graveyard of aristocracies...Potent cause of disturbance in the equilibrium is the accumulation of superior elements in the lower classes and, conversely, of inferior elements in the higher classes.")

শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে আরও একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নতুন সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে, অর্থাৎ সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে, নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ ও অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তন এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বিচলিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা অবক্ষয়ের স¥œÅখীন হয়। যদি শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শাসিতশ্রেণীর স¥œুখে অবস্থানকারী অসাধারণ ব্যক্তিদের নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা না করতে পারে, তবে আকস্মিক সামাজিক পরিবর্তন বা রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ও শাসনে সক্ষম শাসকশ্রেণী পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

প্যারেটোর মতে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও ইতালিতে, শৃগালদের উত্থান ঘটেছিল। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল রাজনীতির কারবারীরা, নীতিহীন আইনজীবীরা, কুতার্কিক বুদ্ধিজীবীরা, ফাটকাবাজরা ও কৌশলপূর্বক নিজ-উদ্দেশ্যসধনকারীরা। কিন্তু তিনি পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত

লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অতীতের মতো এখনও রক্ষণশীল, ধৈর্যশীল ও বলপ্রয়োগে সক্ষম সিংহদের উত্থান ঘটবে এবং তারা বলপ্রয়োগে অক্ষম ও প্রতারণাশীল শৃগালদের অপসারণপূর্বক শাসনক্ষমতা দখল করে নেবে। দেশাত্মবোধ, বিশ্বাস, জাতীয় মর্যাদাবোধ সকলের আনুগত্য আদায় করে নেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করবে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এইভাবে চলতেই থাকবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শৃগাল ও সিংহের উপস্থিতির মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 'ফাটকা কারবারী'—যারা শৃগালসদৃশ এবং 'নির্দিষ্ট উপার্জনভোগী'—যারা সিংহসদৃশ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি প্যারেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এদের স্বার্থ যে শুধু ভিন্ন তাই নয়; এদের মানসিকতাও আলাদা। এই দুটি গোষ্ঠী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতাপূর্ণ কার্য সাধন করে। ফাটকা কারবারীদের গোষ্ঠী মূলত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি আনয়নে সহায়তা করে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের গোষ্ঠী স্থায়িত্ব রক্ষায় সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারীদের ঝুঁকিবহুল আচরণ থেকে উদ্ভূত বিপদ-আপদ নিবারণ করে। যে সমাজে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীরা প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে তা নিশ্চল এবং যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। যে সমাজে ফাটকা কারবারীদের প্রাধান্য তা স্থায়িত্বের অভাবে ভোগে, এক দুর্বল ভারসাম্যগত অবস্থায় বিরাজ করে যা ভেতরের এবং বাইরের সামান্য দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পরে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃগাল ও সিংহদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানই প্রয়োজনীয় সমতা ও নিয়ন্ত্রণ যুগিয়ে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

বিবর্তন ও প্রগতির ধারণাকে প্যারেটো অর্থহীন মনে করতেন। তাঁর মতে, শৃগালতুল্য ব্যক্তি ও সিংহতুল্য ব্যক্তিদের সমাজে আধিপত্য চক্রাকারে আবর্তন করেই চলবে। এই প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যের ভরকেন্দ্র পাল্টালেও ভারসাম্য বিরাজ করবেই। প্যারেটোর মতে, ইতিহাসের পথ বেয়ে নতুন কিছু সংঘটিত হয় না। ইতিহাস মানবীয় নির্বুদ্ধিতার বিবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গরাজ্য কোথাও নেই।

প্যারেটোর তত্ত্বের বেশ কিছু বক্তব্য স¥¤ন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে; যেমন, প্যারেটোর মতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনকে অর্গলবদ্ধ করলে সামাজিক ভারসাম্যর হানি হবে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে এবং নতুন একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী ক্ষমতা অধিকার করবে। অর্থাৎ, কোনও আবদ্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকতে পারে না, সেই গোষ্ঠীর অবসান অনিবার্য। বটোমোর (Tom Bottomore) কিন্তু প্যারেটোর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন যে, আবদ্ধ গোষ্ঠী মাত্রেরই অবসান অনিবার্য একথা বলা চলে না। যেমন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা আবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্য কোনও নিম্নবর্গের মানুষের এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অথচ, আবহমানকাল ধরে ব্রাহ্মণরা তাদের এই আবদ্ধ গোষ্ঠীগত অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্যারেটোর তত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ সর্বক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। এ কারণে অনেকে প্যারেটোর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বটিকে অনৈতিহাসিক বলে অভিযুক্ত করেন। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভারতের সামাজিক বাস্তবতাও এই তত্ত্বকে

অনেকাংশেই সমর্থন করে। জাতপাতের পুরনো বিধান সত্ত্বেও বর্তমান রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক স্তরেও ব্রাহ্মণগণ যে আগের মতো নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করেন না তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে কিংবা মুখ্য উপদেষ্টার ভূমিকায় অথবা প্রশাসনে অব্রাহ্মণদের (এমনকি কিছু পরিমাণে নিম্নবর্গেরও) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপরে উঠে আসা এখন অতি পরিচিত ঘটনা। ব্রাহ্মণ বংশজাত মানুষের এখন যেটুকু কর্তৃত্বের অধিকারী সেটা সম্ভব হয়েছে কৌলীন্যের আবদ্ধ অস্তিত্বের জন্য নয়; বরং সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন শিক্ষাদীক্ষায় পটুত্ব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের উপযুক্ত মনোভাবের ফলে।

মসকা (Gaetano Mosea) কার্ল মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে এই ধারণা অপনোদন করার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁর 'The Ruling Class' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি একথাই বলেছেন যে, সমাজে সবসময়েই একটি শাসকশ্রেণী থাকবে।

মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয় সেই সকল সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজে যাদের ক্ষমতা থাকে। সংগঠন ও কাঠামোর জোরে এই ব্যক্তিবর্গ সমাজে আধিপত্য কায়েম করে বাস্তবে একটি সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র থাকে—আত্মীয়তার যোগসূত্র, স্বার্থের যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ইত্যাদি। এইসব যোগসূত্রের ফলে এদের মধ্যে একটি চিন্তাগত সাযুজ্য ও গোষ্ঠীগত একতা গড়ে ওঠে, যেগুলি সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ—যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বলীয়ান—তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমরূপ নয়, বরং তারা স্তরবিন্যস্ত। এদের মধ্যে খুবই স্বল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি বা পরিবারের অস্তিত্ব থাকে যারা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক ক্ষমতাবান এবং তাদের পরিচালনা করে। এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব দান করে যার ফলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আরও বলিয়ান হয়ে ওঠে। মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেই ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

মসকা তাঁর 'The Ruling Class' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "সমস্ত সমাজে—যেসব সমাজ খুব অল্পই উন্নত এবং কোনমতে সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেগুলি থেকে শুরু করে সবথেকে অগ্রসর ও ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজগুলি অবধি—দুই শ্রেণীর ব্যক্তির দেখা মিলেছে—একটি শ্রেণী শাসন করে এবং একটি শ্রেণী শাসিত হয়। সবসময়েই স্বল্পসংখ্যাবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীটি রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে; একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা অধিকার করে এবং ক্ষমতা যে সুবিধাগুলি আনয়ন করে সেগুলি ভোগ করে, যেখানে অধিক সংখ্যাবিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে যা কখনও কখনও মোটামুটি আইনানুগ, কখনও কখনও মোটামুটি বিধিবহির্ভূত ও হিংস্র এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটিকে, অন্তত দৃষ্টিগোচরভাবে,

ভরণপোষণের বস্তুগত উপকরণসমূহ এবং রাজনৈতিক অবয়বের বৈধতার জন্য যেসব প্রকরণগুলি অপরিহার্য সেগুলি সরবরাহ করে।"

মসকা তাঁর ক্ষমতাশীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছার শাসন'-এর ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, "গণতন্ত্র হ'ল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।" গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে মসকা অস্বীকার করেছেন। মরিস দুভারজারের মতে মসকার তত্ত্বে যে শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা জনগণের শাসন হলেও এই শাসনব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জনগণের ভিতর থেকে উঠে আসে। পৃথিবীর সর্বত্রই যে কোনও দেশ বা জাতি শাসিত হয় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

মসকার মতে, প্রজাতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের তীব্রতা ইত্যাদির উপরে নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক সমন্বিত সামাজিক কাঠামোর উপরেই নির্ভর করে যে একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে বা শাসিত হবে। তাঁর মতে, নিগ্রো ও ভারতীয়গণ নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রগতির যে স্তরে উপনীত হতে পারত তা ইউরোপীয় শাসনের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। নিগ্রোরা যদি শ্বেতাঙ্গদের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা লাভ করত, তা হলে তারা শ্বেতাঙ্গদের মতো উন্নতি করতে পারত না এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। নিগ্রো শিশুরা যখন উপলব্ধি করে যে, তারা নীচ হিসাবে বিবেচিত একটি প্রজাতির সন্তান এবং তারা পাচক ও মালবাহকের চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার আশা করতে পারে না, তখন তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে উন্নতির সব উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

মসকার মতে, সমাজে ডারউইন-কথিত বেঁচে থাকার লড়াই ততটা দেখা যায় না যতটা দেখা যায় বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম। এই প্রবণতাটি সমস্ত সমাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার সংগ্রাম বলতে মসকো বুঝিয়েছেন অর্থ, ক্ষমতা ও স¥œানের জন্য সামাজিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মতো এক্ষেত্রে পরাজিতদের নিহত বা নিশ্চিহ্ন করা হয় না। এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু পরাজিতরা শুধুমাত্র কিছুটা কম পরিমাণে বৈষয়িক তৃপ্তি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে।

মসকার মতে, একটি মৌলিক এবং অপ্রতিরোধনীয় মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম মানুষের স্বভাব গড়ে তোলে। সেটি হ'ল বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য মানুষের আকাঙ্খা এবং তজ্জনিত সংগ্রাম। এই আকাঙ্খাজনিত সংগ্রামের ফলে সমাজে অবধারিতভাবে শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি সমাজেই একটি শাসক ও শাসিতশ্রেণী ছিল, আছে বা থাকবে। মার্ক্স যেভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বদলের সাথে সাথে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেন, তা মসকার কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়। অবশ্য প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যে পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন তা মসকা কখনই বলেননি।

মসকার মতে, যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয় তখন শাসনতান্ত্রিক, সামরিক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব-সমন্বিত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা সংগঠিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কায়েম হয়। মসকা বিশ্বাস করতেন যে, গমতন্ত্রেও এই ধরনের সংগঠিত সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন থাকে। যদিও গণতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণের আদর্শের কথাই বলে

এবং যদিও গমতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণই প্রদর্শিত হয়, তবুও এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই বাস্তবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়।

মসকা গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের সাথে অন্যান্য সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্মুক্ত বলে গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও হল উন্মুক্ত। অর্থাৎ যেখানে শাসিতশ্রেণীর থেকেও যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। এখানে সংখ্যালঘু শাসকদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের আংশিক নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকতে পারে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের উপর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব পরিপক্ষিত হয়। অপরদিকে, সামন্ততান্ত্রিক বা অন্য কোনও ধরনের আবদ্ধ সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও আবদ্ধ হয়ে থাকে। উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে মসকা বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন জনকল্যাণমুখী শাসন। কিন্তু এই শাসন জনগণের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। শাসনের প্রয়োজনে গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববাদী (elitist) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে মসকা গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও সীমিত ভোটাধিকারের কথা বলেছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মসকার মতে, গণ-অসন্তোষের ফলে একটি শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্য থেকে এমন একটি শ্রেণীর উত্থান ঘটবে, যে শ্রেণীটি শাসকশ্রেণীর কার্য সম্পাদন করবে। অন্যথায় গোটা সামাজিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজের প্রাধান্যশীল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এবং বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকার প্রবণতা লক্ষিত হয়। আবার আগের ক্ষমতাশালীদের অবসান এবং নতুন একটি শ্রেণীর ক্ষমতায় অভ্যুত্থানের প্রবণতাও লক্ষিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বারংবার এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর একটি অংশের মধ্যে এই সংঘাতের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সম্পদের নতুন উৎসসমূহের বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, পুরাতন ধর্মের জায়গায় নতুন ধর্মের বিস্তার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। নতুন আবিষ্কার, বিদেশীদের সাথে বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রবাসন ও অভিবাসন প্রভৃতি সমাজে নতুনভাবে সম্পদ বা দারিদ্র্যর স্রষ্টাকার। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব, নতুন নৈতিক চেতনার বিকাশ এবং নতুন বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী নতুন গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে তখন নতুন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়।

মসকা তাঁর তত্ত্বে অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (Sub-elite) সম্পর্কিত ধারণার অবতারণা করেছেন। এই অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয় সরকারি কর্মচারী, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-পরিচালকমণ্ডলী প্রভৃতিকে নিয়ে। এই

শ্রেণীটি একটি বিশিষ্ট সামাজিক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শ্রেণীর অবস্থান হল রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ঠিক পরেই।

শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার উৎস হল তার সংগঠিত সংখ্যালঘুত্ব, যার ফলে এই শ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য কায়েম করে। অসংগঠিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি সংখ্যালঘু শাসকবর্গের সংগঠিত শক্তির কাছে ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন হয়। একটি ছোট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধ কর্মের সুযোগ বেশি থাকে। ফলত, এই সংখ্যালঘু শ্রেণী যা করতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তা কখনও করতে পারে না। মসকার মতে, একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের আয়তন যত বড় হয়, সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর আয়তন তুলনামূলকভাবে তত ছোট হয়। এক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের প্রকৃতি এমন যে জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের জনগণের সেবক থেকে প্রভূতে রূপান্তরিত করে ফেলে। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজেদের সুসংগঠিত করে তুলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য জনসাধারণের তুলনায় এদের বস্তুগত, বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীও উচ্চস্তরের হয়। সংগঠন ও উচ্চতর গুণাবলীর ফলে এরা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি সামাজিক শক্তিসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সামরিক শক্তির বলে যুদ্ধপ্রবণ অভিজাতশ্রেণী সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ থেকে উৎপাদকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সমেত সকল সমাজে দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি। কোনও কোনও সমাজে নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ধর্মীয় শক্তির অধিকার থেকে সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে যাজকশ্রেণীর প্রভাবেই সমৃদ্ধি ও ক্ষমতালাভ ঘটেছিল, কোনও কোনও সমাজে আবার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ফলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার লাভ করা যেতে পারে। সংগঠন, উচ্চতর গুণাবলী এবং সামাজিক শক্তিসমূহের অধিকারের ফলে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী এমন সুবিধা পায় যে আইনে না হলেও বাস্তবে এই শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে শাসনের অধিকার কায়েম করে।

মসকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজাততন্ত্রেরও শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বংশগত ততটা নয় যতটা তাদের বিশেষ ধরনের লালনপালন; যার ফলে এদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে কিছু বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে।

যদিও এই সংগঠিত সংখ্যালঘুদের শক্তি জনসাধারণের চেয়ে বেশি, তবুও তারা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতিরোধকামী জনগণের বিরুদ্ধে এই শক্তির প্রয়োগ করে না। সাধারণত শাসকশ্রেণী একটি "রাজনৈতিক সূত্র" ('political formula') প্রয়োগের দ্বারা তাদের শাসনকে জনগণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে। এই রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও অভ্যাসসমূহ যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে একটি জাতির মধ্যে গড়ে ওঠে। এগুলির উপর নির্ভর করে শাসকশ্রেণী যেসকল মোহ ও বিভ্রান্তির সঞ্চার করে, সেগুলিই এই শাসকশ্রেণীর শাসনকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলে তাকে বৈধতা প্রদান করে। প্রাচীনকালে রাজার শাসনের ঐশ্বরিক অধিকার ছিল এরকম একটি রাজনৈতিক সূত্র। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদ

হল রাজনৈতিক সূত্রের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। একটি শাসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নিম্নশ্রেণীর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সূত্র উদ্ভাবনের উপর। সমাজের অধিক জনসংখ্যাবহুল ও স্বল্পশিক্ষিত স্তরের চেতনায় রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি প্রোথিত থাকা প্রয়োজন। একমাত্র তখনই শাসকশ্রেণী দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হলেও দরিদ্র, শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের আনুগত্যলাভে সক্ষম হয়। কিন্তু মসকা এই সম্ভাবনা কখনও খতিয়ে দেখেননি যে, জনগণের চেতনার মান উন্নত করলে তারা তাদের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক সূত্রকে নাকচ করতে পারে কিনা।

মসকা বলেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটি 'পরিচালক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে যারা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরোধী এবং যারা জনসাধারণের উপর সরকারের তুলনায় বেশি প্রভাবশালী। যখন উচ্চশ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা কমে নমনীয় স্বভাবের আধিক্য ঘটে এবং নিম্নশ্রেণীর প্রত্যাশী ব্যক্তিদের কাছে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নিম্নশ্রেণীর থেকে উঠে আসা শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটায়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে জীবনের কঠোর প্রয়োজন, নিত্যদিনের জীবনসংগ্রাম, সুশিক্ষিত সংস্কৃতির অভাব ইত্যাদির ফলে মানবপ্রকৃতির কুলিশকঠোর ভাবটি সদাজাগ্রত থাকে। মসকার তত্ত্বের এই অংশটি প্যারেটোর তত্ত্বের অনুরূপ। অতএব, প্যারেটো ও মসকা উভয়ের মধ্যেই মেহনতী জনতা সম্ভবন্ধে একটি মুগ্ধতা ছিল যদিও তা মার্ক্সীয় ভাবধারার থেকে একেবারেই আলাদা।

মসকার মতে, একটি শাসকশ্রেণীর ভাগ্য নির্ভর করে তার উদ্যম, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধির উপর। কোনও-না-কোনও ধরনের শাসকশ্রেণী সদাই সমাজে বিরাজ করবে; তা বিলোপের প্রচেষ্টা অর্থহীন। এই উপলব্ধি নিয়ে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বাবস্থা গড়ে তোলাই হল আসল কাজ।

মিশেল্‌সের মতে সংগঠনমাত্রেই মুষ্টিমেয় শাসক বা গোষ্ঠীতন্ত্রের অনমনীয় বিধি বা লৌহবিধির ("the iron law of oligarchy") দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical tendencies of Modern democracy'। এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যে সংগঠনের কথা বলে সে আসলে গোষ্ঠীতন্ত্রের কথা বলে" ("who says organization says oligarchy")।

তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার মতোই মিশেল্‌স্ মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে মানবীয় প্রকৃতির এক ক্ষমতাকামী ধারণার উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীতন্ত্রের আবির্ভাবের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে সংগঠনের যে প্রয়োজন দেখা দেয় তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে গোষ্ঠীতন্ত্রের জন্ম হয়। কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা হল ক্ষমতা কামনা করা এবং একবার ক্ষমতা অধিকার করতে পারলে তা চিরস্থায়ী করা।

জনতার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে মিশেল্‌স্ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ। তিনি বলেছেন যে, একটি ক্ষুদ্র জনতার তুলনায় একটি বৃহৎ জনতার উপর আধিপত্য বিস্তার করা

সহজ। জনতাকে সহজেই অযৌক্তিকভাবে অভিভাবিত ও প্রভাবিত করা যায়। জনতা কোনও গভীর আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানে অপারগ। দ্বিতীয়ত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল গণতন্ত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির অংশগ্রহণের সমস্যা। গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় যে, বিশালসংখ্যক জনসাধারণ একত্রে এবং প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে, তাহলে গণতন্ত্র অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতা আধুনিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সকল ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নিয়ে মিশেল্‌স্‌ পর্যালোচনা করেছিলেন, সেগুলির বিশাল আয়তনের ফলে সদস্যদের সরাসরি আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, তৎকালীন বার্লিনের সমাজতান্ত্রিক দলটিরই সদস্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজারের উপর। আধুনিক দীলয় সংগঠনগুলি বৃহদায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় শ্রমবিভাগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এগুলির আয়তন যত বৃদ্ধি পায় ততই নতুন কার্যাবলীর উদ্ভব ঘটে ও জটিলতা দেখা দেয়। অতএব, কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দলীয় সংগঠনগুলির উদ্ভবের প্রথম স্তরে—যখন সেগুলির আয়তন ছোট থাকে—বিভিন্ন দলীয় পদের সাথে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থের ও ক্ষমতার কোনও সংশ্রব থাকে না। কিন্তু যখনই সংগঠন আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখনই দলীয় পদগুলি অর্থ ও ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। এছাড়াও, শ্রমবিভাগের ফলে কতকগুলি বিশেষ দলীয় কর্মের জন্য দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে দলীয় পদাধিকারী হিসাবে কর্মরত একদল পেশাদার রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে। এরা সংগঠনের সেবক না থেকে প্রভু হয়ে পড়ে এবং সংগঠন আরও উচ্চাবচ্চভাবে বিন্যস্ত ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নিজেদের হাতে প্রচুর সুযোগসুবিধা জড়ো করে। এদের স্বার্থ সাধারণের স্বার্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, এই নেতৃবৃন্দ অপরিহার্য। প্রতিটি দল অথবা শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন স্বল্পসংখ্যক পরিচালক ও বিপুলসংখ্যক পরিচালিততে বিভক্ত হয়ে যায়। সংগঠনের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নীতির প্রতিকূলে শাসক ও শাসিতদের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌স্‌ বলেছেন যে, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সবচেয়ে চরম মতাবল¥¤Ï শাখাগুলি এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার কোনও বিরোধিতা করে না। এক্ষেত্রে যুক্তিটা এই হয় যে, দলীয় গণতন্ত্র শুধু একটি আকৃতিগত বিষয় (form) মাত্র। যেখানে গণতন্ত্রের সাথে সংগঠনের বিরোধ বাধে যেখানে সংগঠনের স্বার্থে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়। সংগঠনই হল সমাজতন্ত্র অর্জনের উপায় এবং ফলত সংগঠনের মধ্যেই দলের বৈপ্লবিক সারবত্তা নিহিত থাকে। সংগঠন বা আধেয়কে গণতন্ত্র বা আধারের স্বার্থে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আরও বলা হয় যে, সংগ্রাম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সদস্যদের শেখানো হয় যে, নিয়মানুবর্তিতাই হল শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য এবং এজন্য নিষ্ঠার সাথে উপরিস্থিত নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা কর্তব্য।

জনসাধারণ উদ্যোগগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। মিশেল্‌স্‌ একে 'জনগণের চিরস্থায়ী অক্ষমতা' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিষয়গুলি সাধারণ সদস্যদের বোধগম্য নয় বলে তারা এসব ব্যাপারে ততটা আগ্রহ বোধ করে না। মিশেল্‌সের মতে, দলের সাধারণ সভাগুলিতে উপস্থিতির স্বল্পতা

থেকেই এদের উদাসীনতার বিষয়টি বোঝা যায়। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও জনগণের আরও কতকগুলি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির ফলে তাদের অক্ষমতা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা দুইই বৃদ্ধি পায়। মিশেল্‌স্ সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক ও কমচারী সংগঠনসমূহের অধিকাংশ সদস্যের বয়স হল ২৫ থেকে ৩৯ বছর। যুবকদের অবসর কাটানোর আরও অনেক উপায় আছে। এছাড়াও তারা কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে যে, কোনও অলৌকিক উপায়ে, অর্থাৎ বাইরের কোনও শক্তির হস্তক্ষেপে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং সারা জীবন তাদের শ্রমিক হিসাবে কাটাতে হবে না। ফলে তারা শ্রমিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়ে। বয়স্করা আবার শ্রমিক সংগঠনগুলির সংগ্রামী ভূমিকার ও সাফল্যের ব্যাপার নির্মোহ হয়ে সদস্যপদ ত্যাগ করে। অতএব, নেতৃবৃন্দ সদস্যদের তুলনায় সাধারণত বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে প্রবীণ হয়। যুবক সদস্যদের অগভীর সমালোচনা তাদের ভীতি উদ্রেকের কোনও কারণ ঘটায় না।

আরও অনেক কারণে সাধারণ সদস্যদের সাথে নেতাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ দেশেই দলীয় নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসে এবং ফলত শুরুতেই তারা সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে উন্নততর হয়। এমনকি জার্মানীর মতো যেসব দেশে নেতৃত্বের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে। সাধারণ সদস্যরা দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে এতটাই ব্যাপৃত থাকে যে, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন নেতা শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হলেও আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তিলাভ করে জনজীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ফলত তিনি সাধারণ সদস্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। সাধারণ সদস্যদের নানা কারণ ঘটিত অক্ষমতা ও নেতৃবৃন্দের বিশেষজ্ঞতা ও উৎকর্ষের জন্যই দলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হয় ও গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌সের মতে, সংগঠনের আসল কর্তৃত্ব 'বৈতনিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত আমলাবৃন্দে'র ('hierarchy of salaried officialdom') হাতে ন্যস্ত থাকে। এখানে মার্ক্সের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার। মার্ক্সের মতে, সম্পত্তির মালিকানা হল কর্তৃত্বের উৎস। অপরদিকে, মিশেল্‌স কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে সাংগঠনিক আমলাতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। এজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে প্রচার চালাতে হয়। দলীয় প্রচারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়। এছাড়াও দল চালনার জন্য দলের আইনগত অবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার হয়। দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা ও সুসমঞ্জস পরিচালন ব্যবস্থার স্বার্থে সুসংহত দলীয় নীতি নির্ধারণও কার্যকর করতে হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। এ সকল দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অবকাশ সাধারণ সদস্যদের থাকে না। নেতারাই দলের গণসংযোগ করা ও দলীয় তহবিল সমৃদ্ধ করার বিষয়গুলি তদারক করেন। সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই ও অন্যান্য দলীয় আনুকূল্য প্রদানের ব্যাপারে শীর্ষ নেতারাই নির্ধারক ভূমিকা পালন করেন। দলের নির্বাচনী সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য দলের সদস্য-সমর্থন ছাড়াও অন্যান্যদের সমর্থন

সংগ্রহের কাজে নেতারাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমসমূহ দলীয় নেতাদের কথাবার্তা ও কার্যসমূহকে গুরুত্বদানপূর্বক ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এই সব কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে দলীয় নেতাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয় এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

নেতাদের এই উত্তরোত্তর অসঙ্গতভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যরা অবশ্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয় উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে। এছাড়াও সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অগ্রণী কিছু ব্যক্তির প্ররোচনাতেই সাধারণত বিদ্রোহ করে। এই অগ্রণী ব্যক্তিদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ সহজেই প্রলুব্ধ করে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। আর কখনও যদি এই বিদ্রোহ সফলও হয়, তখন ঐ অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা ক্ষমতাসীন হয়ে আগের নেতাদের মতোই আচরণ করতে থাকে। সাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলেও সাধারণ সদস্যদের অধিকার রক্ষিত হয় না বরং এর ফলে দলের মধ্যে একটি বিশাল গোষ্ঠীতন্ত্রের বদলে সেই ছোট গোষ্ঠীতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতন্ত্র নিজস্ব অধিকারভুক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে মাঝারি সারির নেতারা কেন্দ্রীয় সকল নেতৃবৃন্দের আগ্রাসী কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

তবে মিশেল্‌সের তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এর কারণ হল যে তিনি নেতৃবৃন্দ ও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের (oligarchs) মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্যনির্দেশ করেননি। সমাজে সবসময়েই নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন আছে তা দেখাতে গিয়ে তিনি কিন্তু নেতাদের সাথে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের গুলিয়ে ফেলেছেন। কীভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয় তাও তিনি দেখাননি। তিনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারের কথা বলেছেন যার ফলে জনপ্রতিনিধিরা পরবর্তী কালে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। কিন্তু বাস্তবে এটা সবসময়েই ঘটেছে কিনা তার যাচাইয়ের মাধ্যমেই এই প্রকল্পটির সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু মিশেল্‌স্ তা করেননি। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মিশেল্‌সের তত্ত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার তত্ত্বের যুক্তিস¥œত পরিণতি।

১। প্যারেটো কাদের ‘শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ’ (‘elites’) বলেছেন?

২। ‘শৃগাল’ ও ‘সিংহ’ বলতে প্যারোটো কী বুঝিয়েছেন?

৩। প্যারেটোর মতে কোন্ অবস্থায় শাসকগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের মধ্যে প্যারেটো কীভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন?

৫। প্যারেটো তত্ত্বর কী ধরনের সমালোচনা করা হয় থাকে?

৬। সমাজে আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স¥œন্ধে মসকা কী বলেছেন?

৭। মসকা সমাজে কোন্ দু’টি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলেছেন?

৮। গণতন্ত্রের ধারণার সাথে মসকার তত্ত্ব কতটা সঙ্গতীপূর্ণ?

৯। একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে না শাসিত হবে—তা কীসের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১০। 'বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম' বলতে মসকা কী বুঝিয়েছেন?

১১। কীভাবে শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং নতুন শাসককুল ক্ষমতায় আসীন হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১২। অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স¥¤ন্ধে মসকা কী বলেছেন?

১৩। সংগঠিত সংখ্যালঘুত্বের ফলে শাসকশ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তুলনার কী সুবিধা ভোগ করে বলে মসকা মনে করতেন?

১৪। সংগঠন ছাড়া আর কোন্ কোন্ কারণে সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বলে মসকা অভিমত প্রকাশ করেছেন?

১৫। কীভাবে মসকার মতে শাসকশ্রেণী তাদের শাসনকে শাসিতদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে?

১৬। নিম্নশ্রেণীর নেতারা কখন ও কীভাবে উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটাতে পারে বলে মসকা মনে করতেন?

১৭। 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধির শাসন' বলতে মিশেল্স্ কী বুঝিয়েছেন?

১৮। কেন জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ বলে মিশেল্স্ মনে করতেন?

১৯। মিশেল্সের মতে দলীয় সংগঠনে কীভাবে নেতৃবৃন্দের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়?

২০। দলীয় সাধারণ সদস্যদের অক্ষমতার কী কী কারণ মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২১। কীভাবে মিশেল্সের মতে দলীয় নেতাদের সাথে সাধারণ সদস্যদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়?

২২। দলীয় নেতারা কী কী কাজের মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করে এবং আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশালী হয় বলে মিশেল্স্ মনে করতেন?

২৩। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যদের বিদ্রোহের কী ফল হয় বলে মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২৪। দলীয় সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণের কী ফল মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২৫। মিশেল্সের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

১। Irving, M. Zeitlin : *Ideology and the Development of Sociological Theory.* (New Delhi : Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. 1969)

২। Guy, Rocher : *A General Introduction to Sociology : A Theoretical Perspective.* (London : The Macmillan Press Ltd., 1972)

৩। Lewis, A. Coser : *Masters of Sociological Thought.* (Jaipur : Rawat Publications, 1996)